করে চলেছে, তবে ওরা ম্যাপ এল. আর. দাগ হিসাবে তৈরি করেছেন। আর আমরা কাজ করছি আর. এস দাগ ধরে, সেজন্য প্রথমে আমাদের সমস্ত আর. এস. দাগের মূল্য এল. আর. দাগের পরিবর্তন করা দরকার। যার সমস্ত রেকর্ড বি. এল. আর. ও অফিসে সি. ডি. হিসাবে পাওয়া সম্ভব। সুতরাং আমাদের দফতর সচেষ্ট হলে সহজেই ভূমি ও রাজস্ব দফতরের মাধ্যমে আর. এস. দাগ সমূহের মূল্য এল. আর. দাগের মূল্যে পরিবর্তন করতে পারেন ও মৌজা ম্যাপ CORD এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। **R.S. দাগের সঙ্গে সঙ্গে LR দাগের মূল্য দেওয়া থাকলে** আমরা LR ম্যাপ থেকে সমস্ত দাগের বর্তমান অবস্থান ও রাস্তার অবস্থান আছে কিনা জানা যাবে। এছাড়া ভূমি ও রাজস্ব দফতরের মাধ্যমে প্রতিটি জমির বর্তমান অবস্থা ও মালিকের তথ্য নেওয়া যেতে পারে। ফলে বাস্তু ল্যান্ড হস্তান্তর প্রতিহত করা যাবে।

২) মৌজা ম্যাপ এবং LR দাগের মূল্য আমাদের সফট্ওয়ারে প্রবেশ করার পর আমরা **প্রত্যেক দাগের বর্তমান অবস্থা এবং প্রস্তাবিত ব্যবহার (Proposed Land Use) কি হতে পারে তাও নির্ধারণ করতে পারি।** যেমন পাকা রাস্তার ধারে বাস্তু ভূমি হলে Commercial purpose হিসাবে প্রস্তাবিত ব্যবহার ধরা যেত পারে এবং দুরকম ব্যবহারের জন্য যদি আমরা পূর্বে মূল্য নির্ধারণ করতে পারি তাহলে জমি মূল্য নির্ধারণ করার সময় যে কোন অফিসারের নিকট একই মূল্য নির্ধারিত হবে। প্রতিটি দাগকে প্রস্তাবিত ব্যবহার অনুসারে বিভিন্ন রঙে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন শুধুমাত্র চাষের জমির ক্ষেত্রে গাঢ় সবুজ বা নং-১, দু-ফসলী হলে ১(ক) হালকা সবুজ, বাস্তু-২, হলুদ Commercial -৩(লাল) ইত্যাদি। প্রয়োজনে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবদানে এরূপ কাজ করা যেতে পারে। মৌজা ম্যাপের জেরক্স ও হার্ড কপির উপরে বিস্তারিত তথ্য নোট করা যেতে পারে। যেমন কোন মৌজার কোন কোন দাগে বাস্তু, পুকুর, স্কুল, লাইব্রেরী, বাজার, হাট আছে তা বলা থাকবে।

প্রস্তাবিত মৌজা ম্যাপের ব্যবহারিক রঙ করণ ও নম্বার ব্যবহার হিসাবে একটি নক্সা (চিত্র-১), হিসাবে যুক্ত করা হলে বুঝতে সুবিধা হবে।

৩) প্রতি **মৌজায় যতগুলি রাস্তা আছে বা যতগুলি রাস্তা (এমনকি গ্রাম্য রাস্তা) ঐ মৌজার উপর দিয়ে গিয়েছে তার নাম সহ** উল্লেখ করতে হবে। প্রতি দাগের হার্ডকপির উল্লিখিত মূল্য শুধুমাত্র কম্প্যুটার বন্দি থাকবে না। প্রয়োজনে ঐ কপি স্থানীয় পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটিতে পাঠানো হবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত সংশোধন করা যেতে পারে। প্রতিটি মৌজায় চাষের জমির, বাস্তু জমির, Commercial জমির মূল্য সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্ধারণ করতে হনবে। এর ফলে কোন ভাবেই যেমন কম্প্যুটার এ কম মূল্য আসবে না **তেমনি অবাস্তব ফলাফল ও হবে না।**

৪) কোন দাগের মূল্য নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাগের মূল্য জানা অত্যন্ত জরুরি। এমনকি ঐ দাগের ইতিপূর্বে অধিকমূল্যে জমি বিক্রয় হয়ে থাকলে তা মূল্য নির্ধারণের সময় বিবেচিত হওয়া দরকার। প্রয়োজনে, দুই বা তার অধিকবার বেশী মূল্যে বিক্রয় হলে গড় মূল্য হিসাবে, proposed land পরিবর্তন করে মূল্য বৃদ্ধি হতে পারে। এখনকার অবস্থায় ঐ দাগে কতগুলি দলিল হয়েছে, কি দাগে হয়েছে তা জানা যায় এবং তা আলাদাভাবে খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে, system প্রতিক্ষেত্রে আলাদা করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্লেখ করবে এবং সেই অনুসারে মূল্য নির্দ্ধারণ করবে এবং অনুরূপ সুবিধা দেয় Query গুলিতে প্রযোজ্য হবে।

৫) বর্তমান যুগে Internet Connection এর মাধ্যমে এক অফিসের তথ্য অন্য অফিসে পৌছে দেওয়া যায়। যদি আমাদের প্রতিটি দলিলের মূল্যায়ণের সমস্ত তথ্য অন্যান্য অফিসে সহজেই পৌছে যেত, তাহলে সেই অফিস মিথ্যা তথ্য ধরে ফেলতে পারতো। তাই এখন জরুরি Cord কে ইনটারনেট মাধ্যমে যুক্ত করা। ব্যাঙ্কে যদি টাকা পয়সা লেনদেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইনটারনেটের মাধ্যমে, যেকোন ব্যাঙ্কে টাকা অন্য ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে বা জমা দিতে পারে তাহলে আমরা কেন নেট এর মাধ্যমে মূল্য জানার সুযোগ করে দিতে পারবো না। তাই যত দেরি করে নেট সংযোগ হবে, তত আমাদের প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া বর্তমানে এল. আর. নোটিশ আর সার্ভ হয়না বললেই চলে। নেট সংযোগ হলে আমরা নেট মাধ্যমে প্রতিদিন এল. আর. নোটিশের তথ্য পাঠিয়ে দিতে পারি। ফলে, BL & LRO দফতরের পক্ষে সহজে জানতে পারে কোন কোন দাগের হস্তান্তর হয়েছে।

৬) আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যে, কম্পিউটারের মাধ্যমে যাতে করে নির্দিষ্ট কোন দাগের মূল্য সম সুবিধাপ্রাপ্ত ভূমির সমমূল্য নির্ধারণ হয়। তাই convertion ratio এর মত কোন ক্ষ্যাপা গণিত ঢুকিয়ে মূল্য নির্ধারণ করা বন্ধ করতে হবে। পরিবর্তে প্রত্যেক মৌজায়, চাষযোগ্য জমি, ডাঙ্গা, বাগান, বাস্তু বা semi commercial বা commercial ভূমি সর্ব্বনিম্ন ও সর্ব্বোচ্চ দাম কত হতে পারে তা পূর্বে নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে। উদাহরণ দিয়ে বোঝান যাক। ধরা যাক কোন ভালো চাষের জমির মূল্য দেওয়া ৩০০০ টাকা প্রতি শতক বা ৯৯০০০ প্রতি বিঘা হলে। ঐ জমিকে বাস্তু হিসাবে হলে ৩০০০ x ৬ = ১৮০০০ টাকা প্রতি শতক হিসাবে Convertion ratio তে মূল্যায়ন হবে। কিন্তু যদি বর্তমান

পদ্ধতিতে হয়, বাস্তুর পূর্বনির্ধারিত মূল্য ১০০০০ টাকা প্রতি শতক হিসাবে হতে পারে। আমরা যদি আগে থেকে জেনে থাকি যে জায়গাটি বাস্তুর উপযুক্ত তাহলে আমরা বাস্তু হিসাবেই মূল্য নির্ধারণ করে রাখবো। Commercial বা Semi Commercial দাগগুলি চিহ্নিত করে ও মূল্য নির্ধারণ করে রাখতে হবে।

৭) অতি দ্রুততার সঙ্গে মূল্য সংশোধন করার জন্য (তাড়াতাড়ি মূল্য আপডেট করতে হবে) নেট এর মাধ্যমে সরাসরি সুপারিশ করা যাবে। যদি কোন এলাকায় হঠাৎ দেখা যায় কোন কোম্পানি জায়গা নিচ্ছে বা কোন নূতন কোন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, তাহলে মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই সারা বৎসর ধরে মূল্য আপডেট করা যেতে পারে। প্রতি জেলায় খবরদারি বাড়াবার জন্য অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধক নিয়োগ হওয়া উচিৎ যারা মূল্য ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তদারকি করবেন। প্রয়োজনে জমির অধিক মূল্য হলে অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধকের নিকট আপিল করার ব্যবস্থা দরকার। জেলা নিবন্ধক বা অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধক যারা ভূমি Inspection করে মূল্য কমাতে বা বাড়াতে পারবেন সেক্ষেত্রে ঐ মূল্য নেট মাধ্যমে ডাটা আপডেট হয়ে যাবে।

৮) বর্তমানে চালু পদ্ধতি অর্থাৎ Convertion ratio দ্বারা কোন জমির মূল্য দ্বিগুণ তিনগুণ থেকে দশগুণ অবধি বাড়ানো যেতে পারে। ফলে যারা সরকার কর্তৃক ক্ষতিপূরণ (Compensation) নেবার দরকার তারা এই পদ্ধতি থেকে দেখাতে পারে জায়গার মূল্য বর্তমানে অধিক। ফলে সরকারের পক্ষে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা। তাছাড়া যত মূল্যের তারতম্য করার ব্যবস্থা থাকবে, যেকোন মানুষ তার অপব্যবহার করতে থাকবে। সুতরাং বাড়তে থাকবে দুর্নীতি। কম্পিউটার মাধ্যমে কোন সঠিক মূল্যায়ণ আদৌ হল কি? প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বতন্ত্র বা আলাদা, তেমনি প্রত্যেকটি জমির পরিচয় ও তার মূল্যায়ণ আলাদা আলাদা। ফলে সঠিক মূল্যায়ণ করতে গেলে জমির অবস্থানসহ প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করা মূল্য নির্ধারণ করা উচিৎ ঠিকই সেক্ষেত্রে ১০-৩০% কমবেশী করার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কিন্তু কখনও সেটা মাত্রারিক্ত হবেনা।

৯) আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ব্যাক্তিরা রেজিষ্ট্রেশন আইন বা রুলের খুঁটিনাটি স্ট্যাম্প অ্যাক্টের বিষয়সমূহ অন্ধকারে থাকে। আমরা যেহেতু দলিল রেজিষ্ট্রি হবার পূর্বে Assesment Slip দিয়ে থাকি, তাই আমার মতে ঐ স্লিপে বিশেষ বিশেষ আইন বা রুলগুলো উল্লেখ রাখা ভালো। প্রয়োজনে বাংলায় লিখে দিলে গরিব, অল্পশিক্ষিত মানুষেরা উপকার পাবে।

তাই এখানে আমার মত, যে সমস্ত বিষয় পূর্বে আমার মূল্যায়ণ করার সময় বিবেচনা করতাম, যেমন রাস্তা আছে কিনা, বাস্তু, স্কুল, বাজার হাট, হসপিটালের নিকটবর্তী কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি, যেগুলি বিবেচনা করে প্রথমে প্রতিটি দাগের মূল্য ঠিক করা উচিৎ, এবং অধিক কিছু বিবরণ দলিল সম্বন্ধীয় পক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করে ঐ ১০-৩০% মূল্য তারতম্য করা হউক।

পরিশেষে বলি, রাজ্যে এখন পরিবর্তনের বাতাবরণ চলছে। নতুন সরকার পরিবর্তের পক্ষে এবং দূর্নীতি নিবারণে সচেষ্ট হয়েছেন। সুতরাং এই মহেন্দ্রক্ষণে আমাদের উচিৎ সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়ে, মানুষের জন্য ভাবা, সরকারী মূল্যায়ণে স্বচ্ছতা আনা, সরকারী কোষাগারে আয় বাড়ানো। একটা বাস্তব সম্মত জমির মূল্য সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য একত্রিত করে ডাটা ব্যাঙ্ক তৈরী করা, যা বাঁচাতে পারে আমাদের অফিসারদের দৈহিক ও মানসিক চাপ থেকে। আপনি এখনও এই বাংলার আমাদের দফতর ছাড়া অন্য দফতর পাবেন কি যেখানে একজন মাত্র অফিসারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা সরকারী আয় আসছে। যেখানে ১৫০কোটি অর্থ আসে একটি অফিসের মাধ্যমে সেখানে যেমন একটি মাত্র অফিসার, আবার যেখানে ১ কোটি অর্থ আয় হয় সেখানেও একজন মাত্র অফিসার। সারা জেলায় সেখানে ১০০০কোটি আয়, তদারকি করার জন্য একজন জেলা নিবন্ধক, একজন D.I.G.R. আর কোথাও ৩০ কোটি আয় তদারকি করার জন্য একজন জেলা নিবন্ধক ও একজন অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপক D.I.G.R.। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দরকার এই সমস্ত সমস্যা দৃষ্টিগোচর করে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে বর্তমান আয়ের দ্বিগুণ সরকারী আয় বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় গতানুগতিক পথে মানুষের হয়রানি, দুর্নীতি স্বার্থপরতা বেড়েই চলবে। আশা করবো, আমার মত অধিক সংখ্যক লোক এই সমস্যাটি নিয়ে ভাবছেন। চিন্তাভাবনা করছেন। তারাও তাদের সুনির্দিষ্ট মত দিয়ে এবং এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করবেন যাতে আমরা চাপমুক্ত হব এবং জমির মূল্য সঠিক হবে।

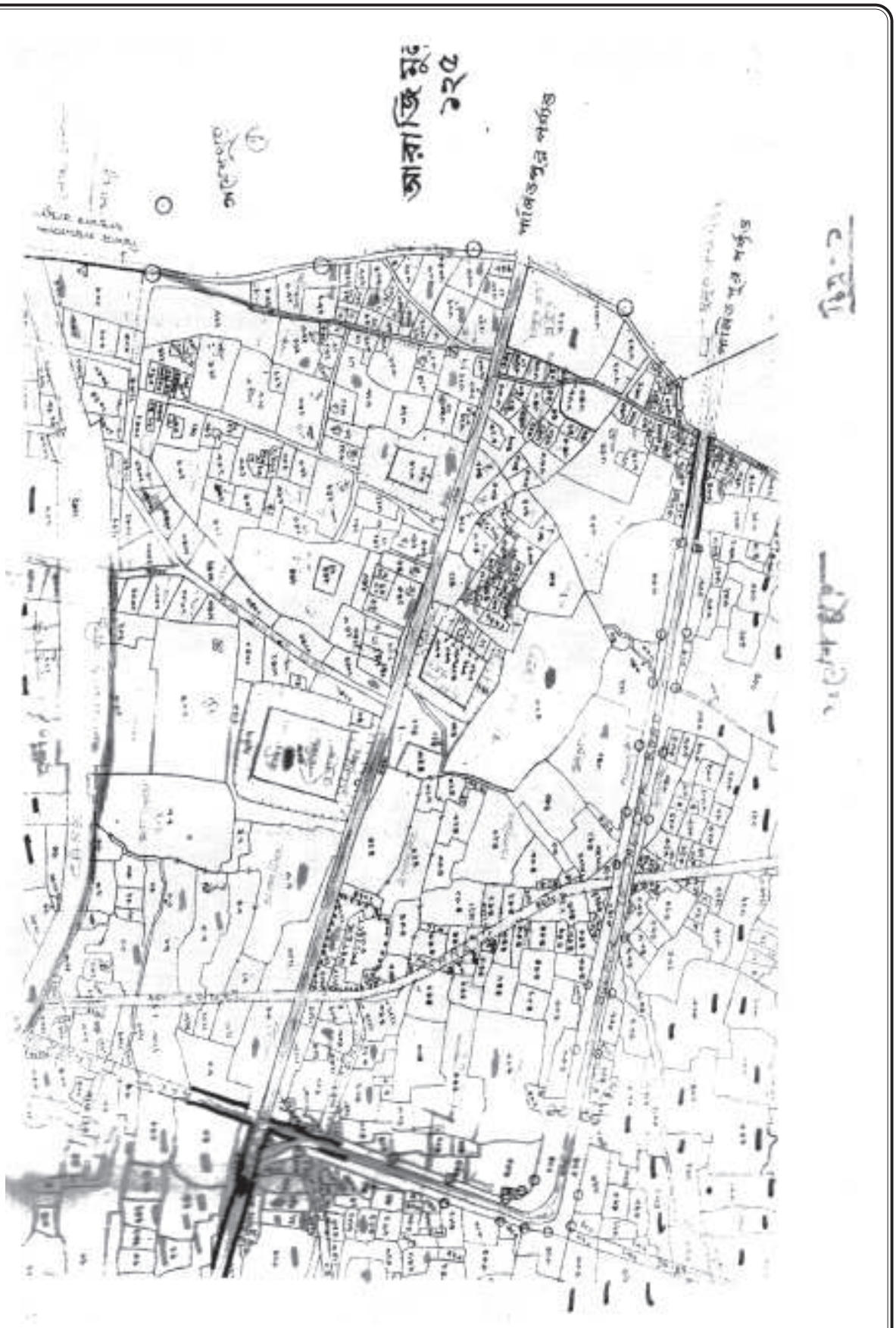

Balank

শতবর্ষ পেরিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট

শোভন মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., ভগবানগোলা

গোয়েন্দা বরদাচরন ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে অপরাধীর 'ফিঙ্গারপ্রিন্ত' দেখার চেষ্টা করতো কিনা আমাদের জনা নেই। তবে শার্লক হোমস্ এ ব্যাপারে যে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার আর্থার কোনান ডায়েলের বিখ্যাত গল্প 'The Norwood Builder'-এ শার্লক হোমস্ রহস্যের সমাধান করেছিলেন ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে। তবে শুধু গল্পে নয় বাস্তবিক জীবনে ফিঙ্গার প্রিন্ট হল কোন মানুষের সনাক্তকরণের এক অভ্রান্ত উপায়। এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের কদর আমরা বুঝেছি একশো বছর অগে। যদিও এটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে তারও আগে থেকে।

খ্রীষ্টের জন্মের কয়েকশো বছর আগে ব্যবলনীয় সভ্যতায় হাতের আঙুলের ছাপ নেওয়ার প্রথা চালু ছিল। মূলত কোনো রাজ রাজাদের মধ্যে চুক্তি হলে মাটির পাত তৈরী করে তার উপর লিপিবদ্ধ করা হত। চুক্তির শেষে দুই রাজার হাতের আঙুলের ছাপ নেওয়া হত। পরবর্তী কালে চীনেতেও এই ধরনের প্রথার চল দেখা যায়। তবে এই আঙুলের ছাপ দিয়ে যে মানুষের সণাক্তকরণ সম্ভব তা তাদের অজানা ছিল বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ব্যাবিলনীয় সম্রাট হামুরাবির সময় সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের হাতের ছাপ নেওয়া হোত। তবে চীনা সম্রাট কিয়া-ক্যুং-ইয়েন ফিঙ্গারপ্রিন্টকে প্রথম সনাক্তকরনের উপায় হিসেবে ভেবেছিলেন। কিন্তু ফিঙ্গার প্রিন্ট তখনও মানুষের কাছে তার অসাধারণ মহিমা নিয়ে হাজির হয়নি। যদিও তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। শারীরবিদ্যার অসামান্য উন্নতির ফলেই সপ্তদশ শতকে মানুষ প্রথম বুঝতে পারলো প্রতিটি মানুষের হাতের রেখা বিন্যাস ভিন্ন বা unique. কারর সঙ্গে কারর কোনো সাদৃশ্য নেই। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী পারকিনজীর নাম এই ব্যাপারে উল্লেখ করা যায়। তিনি এই ব্যাপারটি প্রথম নজর করেন।

আসলে ফিঙ্গারপ্রিন্টের এই unique characterটি বিজ্ঞানের কিছু বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' কথাটির অর্থ হল হাতের আঙুলের অসমান রেখার ছাপ। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাবলে 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' আসলে হাতের যে কোন অংশের ছাপ এমনকি পায়ের পাতার ছাপও 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট', হিসেবে বিবেচিত হয়। আসলে হাতে বা পায়ের ত্বকের উপরের 'এপিডারমিস' অংশটির ছাপই হল 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট', ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা সনাক্তকরণকে বলে 'Dactyloscopy'.

অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক নির্ভরযোগ্য প্রমান। এর নির্ভরযোগ্যতা বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত, ফরেনসিক তথ্যানুসন্ধানে ফিঙ্গারপ্রিন্ট তাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কোন মানুষের স্বাক্ষর জাল করা গেলেও হাতের রেখা জাল করা প্রায় অসম্ভব।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' দু রকমের হয়। একধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট খালি চোখে দেখা যায় না। মূলত ধুলো-ময়লা, রক্ত, ঘাম বা তেলকালির ফলে কোন জিনিসের ওপর হাতের ছাপ পড়লে সহজে বোঝা যায় না। একে অদৃশ্য বা গুপ্ত বা Latent Finger Print বলে। আর এক ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে যে গুলোতে হাতের রেখা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কোন কাদার ওপর বা মোমের ওপর হাতের ছাপ এই ধরনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট', একে ফরেনসিক পরিভাষায় 'Plastic Finger Print' বলে। প্লাস্টিক ফিঙ্গারপ্রিন্টে খুব সহজে হাতের রেখা সনাক্ত করা গেলেও অদৃশ্য ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে ফরেনসিক পদ্ধতিতে রেখাগুলি স্পষ্ট করা হয়। অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে এটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। আদালতেও হাতের রেখার ফরেনসিক রিপোর্টকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেবল অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে নয়, যে কোন নথিপত্রে স্বাক্ষরের বিকল্প হিসাবে 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' অভ্রান্ত। এতটাই বিশ্বস্ত যে দলিল দস্তাবেজে 'স্বাক্ষর নেওয়া হলেও হাতের ছাপ দেওয়া বাধ্যতামূলক। বর্তমানে Live Scan-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' সংরক্ষন করা হয়। এই 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' unique এবং indivitual character কে কাজে লাগিয়ে তৈরী হয়েছে Biometric attendance বা Finger print Lock, ভবিষ্যতে আরও অনেককিছু আমরা দেখতে পাবো। সারা বিশ্ব জুড়ে সরকারী ভাবে Finger print এর ব্যবহার একশো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রথমে সামরিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হলেও পরে পুলিশের কাছে অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে এটি হয়ে ওঠে এক উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার।

প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের মধ্যে কম্পিউটারের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রত্যেকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট অন্যের থেকে আলাদা। এর উপর ভিত্তি করে সারা বিশ্বজুড়ে পুলিশ এজেন্সিগুলোতে গড়ে উঠেছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যাঙ্ক। এর ফলে পুরনো অপরাধীকে সহজে ধরা সম্ভব হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে শুরু হয় এর ব্যবহার। আমেরিকায় এর ব্যবহার শুরু হয় ১৯০২ সালে। এই বছরেই প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্টের উপর ভিত্তি করে অপরাধী ধরা হয়। 'Scheffer' নামে এক ব্যক্তি অপরাধ করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তাকে জেল থেকে ছাড়ার সময় ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী কালে এক বৃদ্ধ খুনের ঘটনায় শোকেসের ওপর ফিঙ্গারপ্রিন্টের ছাপের সঙ্গে তার, হাতের ছাপ মিলে যায়। তাকে ধরা হয়। এটিই ছিল ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে অপরাধী ধরার প্রথম কেস।

ভারতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো প্রথম স্থাপিত হয় ১৮৯৭ সালে কোলকাতাতে এবং এই ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ ছিলেন আজিজুল হক এবং হেমচন্দ্র বোস। ভারতবর্ষে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। এঁদের উৎসাহতেই ভারতে প্রথম ফিঙ্গারপ্রিন্টের চর্চা শুরু হয়।

আগেই বলেছি, 'Plastic Finger Print সহজে বোঝা গেলেও 'Latent Finger Print' বোঝার জন্য ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। প্রায় একশো রকম পদ্ধতি থাকলেও কুড়ি রকম পদ্ধতি বহুল প্রচলিত। নিনহাইড্রিন, ডায়াজোফ্লুওরেনল ও ধাতব ডিপোজিশনের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ফিঙ্গার প্রিন্টকে ডেভেলপ্ করা হয়। এই ব্যাপারে গবেষণার জন্য 'The International Fingerprint Research Group' (IFFG) গঠন করা হয়। আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইজরায়েলের প্রতিনিধি নিয়ে এই গ্রুপ গঠিত হয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এরা গবেষণা করে। এই গবেষণা এখন এমন উন্নত পর্যায়ে চলে গেছে যে কেবল সনাক্তকরণ নয়, ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে কোনো মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যও জানা যায়। যেমন মানুষটি ধূমপান করে কিনা। কফি বেশী পান করে না কম! বা কোনো ওষুধ নিয়মিত খায় কিনা। এসব জানা যায়।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিষয়ে এখন কয়েক কদম এগিয়ে রয়েছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা FBI। তাদের কাছে এই মুহূর্তে পঞ্চাশ মিলিয়নের বেশী ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহে রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এমন দাঁড়াচ্ছে যে, যে সব গোয়েন্দা সংস্থার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যাঙ্ক যত বেশী সমৃদ্ধ তাদের অপরাধী ধরার সাফল্যও তত বেশী।

এবার ফিঙ্গারপ্রিন্টের সজ্জা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের সজ্জা তিন প্রকারের — ফাঁস(loop), কুণ্ডলাকার (whorl) এবং arch (ধনুকাকৃতি)। এই সজ্জা বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন সংখ্যার হয়। এর ওপর ভিত্তি করেই মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরী হয়। অনেকটা সমবায় বা বিন্যাসের মতো ব্যাপার। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় কেবল মানুষের নয়, মানুষের মতো প্রাণী যেমন গরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতিদেরও unique ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়েছে।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা বলতে গিয়ে Foot Print এর কথাও বলতে হয়। পায়ের আঙুল বা পায়ের চলার ছাপও বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন। ১৯৩৪ সালে আমেরিকাতে প্রথম ফুটপ্রিন্টকে প্রামান্য হিসাবে কোর্টে গ্রহণ করা হয়, বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে একে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও হাতহীন প্রতিবন্ধী মানুষদের পায়ের আঙুলের ছাপ নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ফিঙ্গারপ্রিন্টের Unique' বৈশিষ্ট্য আসলে প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি। মানুষের নিজ নিজ সত্তাকে যেন রূপদান করে নিজস্বতাকে চিহ্নিত করে। প্রকৃতি যেন তর্জনী দেখিয়ে বলে 'হে মানবজাতি, তোমরা ভিড়ের মধ্যে মিশে যেতে পারো, কিন্তু হারিয়ে যেতে পারবে না কখনো।"

তথ্যসূত্র ঃ

i) উইকিপিডিয়া

ii) History of the Fingerprint system–Berthold Laufer.

iii) Suspect Indentities : A history of Finger printing and criminal identification—Simon Cole.

জীবন-পথে

ভৈথলি প্যাসেঞ্জার

তাপস কান্তি ঘোষ
এ. ডি. এস. আর., জলপাইগুড়ি

এক

'এই যে ম্যাডাম, এদিকে।' চৈত্রসেলের ভিড়ে ঠাসা ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক অতি পরিচিত পুরুষকণ্ঠের ডাকে থমকে গেল বিচিত্রা।

গত অক্টোবরে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়া বিচিত্রা অবসর নেওয়া ইস্তক বাইরে খুব একটা বেরোয় না বললেই চলে। সারাটা চাকরি জীবন প্রচুর জার্নি করেছে, তাই এখন নিভৃতেই ভালো লাগে। বাইরে বেরোনো বলতে মাসে একবার ব্যাঙ্কে pension তুলতে যাওয়া, আর মাঝে মধ্যে নাতিটার টানে তিন-চার কিলোমিটার দূরে মেয়ে-জামাই এর Flat-এ যাওয়া। বাকি ঘর-বাইরের যা কিছু কাজ, তা সর্বক্ষণের Maid Servant অনিতাই করে। গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে অনিতাই বিচিত্রার সংসার সামলাচ্ছে। একমাত্র মেয়ে চিত্রলেখার বিয়ে হয়ে যাবার পর এবং তার ঠিক পর-পরই তথাগত অকালে চলে যাবার পর বিচিত্রার শুধু শরীরটুকুই ইহজগতে থেকে গেছে। কর্মস্থলে যাতায়াতের দরুণ শরীরটুকুই ইহজগতে থেকে গেছে। কর্মস্থলে যাতায়াতের দরুণ সেটুকু জীবনছন্দ অবশিষ্ট ছিল তাতেও গত ৩১শে অক্টোবর যতিচিহ্ন পড়েছে. বিচিত্রা এখন সম্পূর্ণরূপেই ছন্দহীনা, গতিহীনা।

চেনা কণ্ঠস্বরটি আবার ডেকে উঠল, 'ম্যাডাম, এদিকে।' অনেকদিন পর বিচিত্রা আজ সকালে মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। দুপুরটা কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ফিরছে। তাড়া তো ছিলই। কারণ বিকেল থেকেই আকাশ জুড়ে কেমন যেন মেঘ করেছে। গত পাঁচ-ছয়দিন ধরে যা অসহ্য গরম পড়েছে, কালবৈশাখীর পূর্ব লক্ষণ আর কি। মেয়ে কিছুতেই ফিরতে দিতে চাইছিল না। কিন্তু বিচিত্রা গোঁ ধরেই চলে এসেছে। এখন ঝড় এসে পড়ার আগে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়। বাতাস বেশ ভালো জোরেই বইতে শুরু করেছে। এমন সময় কেন আবার পেছন থেকে উটকো ডাকাডাকি। অন্য সময় হলে বিচিত্রা ignore করত। জীবনের এই পর্যায়ে এসে পরিচিত লোকদের সাথেও আর মিশতে ইচ্ছা করে না। রাস্তা-ঘাটে অনেক চেনা লোক-জনের সঙ্গে চোখাচোখি হলেও বিচিত্রা তাই এড়িয়ে যায়। পাছে আবার কথা বলতে হয়। কথা বলতে একদম এখন আর ভালো লাগে না। ঘরে একাকী বসে থাকতেই ভালো লাগে।

কিন্তু না। এ কণ্ঠস্বরকে ignore করা গেল না। অগত্যা বিচিত্রা হাঁটা থামিয়ে কণ্ঠস্বরের অধিকারী ব্যক্তিটির অনুসন্ধানে মুখ ফেরালো।

দুই, পুরনো সেই দিনের কথা

আজ সপ্তাহ খানেক হল বিচিত্রা একটি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে জয়েন করেছে। নিয়োগপত্রটি যখন পোস্টম্যান মাঝদুপুরে রেজিষ্ট্রি ডাকে রিসিভ করিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখন বিচিত্রার ঘুণাক্ষরেও ধারণা ছিল না ওর মধ্যে আর কতদিনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটি লুকিয়ে আছে। আসলে প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বিচিত্রা এখন সম্পূর্ণরূপেই মাঝবয়সী এক গৃহবধূ। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়া মেয়ে চিত্রলেখার ভবিষ্যৎ গড়াই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। প্রথম জীবনে এবং বিয়ের পরও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একান্ত বাসনায় প্রচুর চাকরির পরীক্ষা বিচিত্রা দিয়েছে, কিন্তু কোনোটাতেই কিছু হয়নি। ব্যর্থ মনোরম হয়ে সংসার কর্মেই মনোনিবেশ করতে হয়েছে। একটি স্কুলের চাকরির প্যানেলে নাম থাকা সত্ত্বেও কোর্টকেসের দরুণ সে প্যানেলের ওপর স্থগিতাদেশ হয়ে যায়। ভীষণ হতাশ হয়েছিল বিচিত্রা সেই ঘটনায়। অবশেষে, এতগুলো বছর পর সেই স্থগিতাদেশ ওঠার এবং কোর্ট পুরনো প্যানেলকেই বহাল রাখার শিকে ছিঁড়ল বিচিত্রার কপালে।

কিন্তু নিয়োগপত্র পাওয়ার মুহূর্তের সেই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি যখন জানা গেল যে স্কুলের জন্য বিচিত্রাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে সেটি বিচিত্রার বাড়ি থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার দূরে এবং তারপরও ভ্যানে করে দুই কিলোমিটার যেতে হবে। এই বয়সে সপ্তাহে ছয়দিন একশ' চল্লিশ কিলোমিটার করে বাস জার্নি! আঁৎকে উঠেছিল বিচিত্রা।

স্কুলের জয়েন করবার সপ্তাহ খানেক পর আজ বিচিত্রা বুঝতে পারছে জয়েন করবার আগে বিচিত্রা যা কল্পনা করেছিল, বাস্তব আসলে তার চেয়েও ভয়াবহ। এই ছয় দিনেই যেন তার ছয় বছরের এনার্জি শেষ হয়ে গেছে। এ তো স্কুলে চাকরি করতে যাওয়া নয় যেন প্রতিদিন প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য যুদ্ধ করতে বেরোনো।

১১টায় মেন গেট বন্ধ হওয়ার আগে স্কুলে পৌঁছতে গেলে সকাল আটটায় ঘর থেকে বেরোতেই হয়। তার আগে চিত্রলেখাকে স্কুলের জন্য তৈরী করা এবং বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে তথাগতকে কর্মস্থলে পাঠানো। তারপর নাকে-মুখে কিছু গুঁজে দৌড়তে দৌড়তে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছনো। যদিও প্রথম তিনদিন তথাগত বিচিত্রার সঙ্গে ছিল। কিন্তু ওর পক্ষে ও তো Office কামাই করে এভাবে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়।

বিচিত্রাকে মাঝ Stoppage থেকে বাস ধরতে হয় বলে তার প্রাত্যহিক যুদ্ধের দ্বিতীয়ভাগ শুরু হয় ভীড়ের বাসে ওঠা দিয়ে এবং তৃতীয়ভাগে আসে ভীড় বাসে সীটের অনুসন্ধান। কারণ, ভীড় বাসে দীর্ঘ দু'ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই কে Nearest Stoppage-এ নামবে তার সন্ধান করতেই হয়। কিন্তু সেখানেই তো এক বিশাল যুদ্ধ! এ তো সীট দখল নয় যেন রাজ্য জয় করে সিংহাসন লাভ। কারণ, বাসটা ভর্তি থাকে নিত্যযাত্রীদের ভিড়ে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যেকেরই একই আশা কেউ উঠলে তার জায়গায় বসা। কিন্তু সীট খালি করা যাত্রীর চেয়ে সীট-প্রত্যাশী যাত্রীর সংখ্যা যে কয়েকগুণ! ফলে পরবর্তী Stoppage আসার আগেই দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় সীট দখলের এক চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ যেন এক প্রতিদিনের Race। সফল হলে বাকি একশ' মিনিটের বসা যাত্রা, নতুবা, আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা এবং Second Next Stoppage -এর আরো কিছু যাত্রীর সীট খালি করার অপেক্ষা এবং অবার এক 'সীট যুদ্ধের' জন্য অবতীর্ণ হওয়া। কোন কোন দিন এই যুদ্ধ করতে করতেই যাত্রা শেষ হয়ে গেছে। সীট আর মেলেনি। সপ্তাহে ছ'দিনই বিচিত্রার এই সাফল্য, ব্যর্থতা এবং যুদ্ধযাত্রা। সেইসঙ্গে ফেরার পথেও।

তিন

আজ প্রায় দেড় বছরের উপর হল বিচিত্রার এই নিত্যদিনের যুদ্ধযাত্রা চলছে। এখন সে কিছুটা হলেও এই রুটিনে ধাতস্থ। প্রতিদিন যেতে যেতে অনেক নিত্যযাত্রীর সাথেই আলাপ হয়েছে। প্রথম দিকে এত দীর্ঘ সময়ের নিত্যযাত্রাতে যে মানসিক চাপ পড়ত, সেটা এখন, অনেক পরিচিত মুখের সান্নিধ্যে এসে অনেকটাই কেটে গেছে। কিন্তু নিত্যদিনের 'সীট প্রাপ্তির' কোনো সুরাহাই হয়নি। এই রুটের ভীড় বাসের নিত্যযাত্রীদের কাছে 'সীট সাধনা' একটি এমনই স্পর্শকাতর বিষয় যে, কেউ যত পরিচিতই হোক না কেন, এ ব্যাপারে কেউ কাউকে সূচ্যাগ্র মেদিনী ছাড়তেও প্রস্তুত নয়। ফলস্বরূপ, বিচিত্রার 'সীট-যুদ্ধ' এখনও অব্যাহত। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাড়ির বাড়তি চাপ। মেয়ে বড় হচ্ছে, ফলে তার প্রতিও বাড়তি নজর দিতে হয়। তথাগত বদলি হয়ে যাওয়ায় বাড়ির বাজার ঘাট সহ বাড়তি দায়িত্বটাও এখন তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আগের মতো House Wife হলে এ চাপটা হয়তো সে সহজেই সামলে দিত। কিন্তু নিত্যদিনের অমানবিক জার্নিটাই তো সমস্ত কর্মশক্তিটা নষ্ট করে দিচ্ছে। জীবনটা যেন প্রেসার কুকারের ভীতরের বায়ুর মত হয়ে চলছিল। দিনে দিনে উচ্চচাপযুক্ত উত্তপ্ত বায়ু। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনে নতুন করে স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া বা পাওয়ার ছিল না। যেন একটি মেশিন। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করে যাওয়া। লক্ষ্য একটাই, মেয়েটিকে সুনিশ্চিত সুন্দর জীবন দেওয়া।

প্রতিদিন বাসে যেতে যেতে সীট না পেয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এসবই সংসারের সাত-পাঁচ কথা চিন্তা করে বিচিত্রা। আজও সীট প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নাই দেখে নিজেরই চিন্তায় মগ্ন ছিল সে। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল এক অপরিচিত পুরুষকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানে, 'এই যে ম্যাডাম, এদিকে'।

এক অপরিচিত মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বিচিত্রাকে আহ্বান জানাচ্ছে তার নিজের ছেড়ে যাওয়া সীটটিতে বসবার জন্য। এই রুটের ভীড় বাসে যা একান্তই অকল্পনীয়। এতো বিনাযুদ্ধে রাজ্য প্রাপ্তি! আরও অনেককিছু ভাববার ইচ্ছা করছিল বিচিত্রার। কিন্তু এ ভাববার সময় নয়, এ করবার সময়। ফলে কালক্ষেপ না করে বিচিত্রা সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। পরে যখন মনে হ'ল ভদ্রলোকটিকে একটু ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, ততক্ষণে তিনি ভীড়ের জনসমুদ্রে অতিক্রম করে Next Stopageএ নেমে গেছেন।

কিন্তু বিনাযুদ্ধে সীটলাভের এই ঘটনাটি বিচিত্রার নিত্যযাত্রার জীবনপঞ্জিকায় বিক্ষিপ্ত এক ঘটনা হয়ে রয়ে গেল না। পরের দিনও এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

আজ তৃতীয় দিন। বিচিত্রা রোজকার মত বাস ধরার জন্য হন্তদন্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে আসছে। হঠাৎ-ই অবচেতন মনে অপরিচিত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে গেল। বিচিত্রা মানুষের মুখ ভালো করে মনে রাখতে পারে না। ভীড়ের মধ্যে আলগাভাবে ছুঁড়ে দেওয়া কথার মালিকের মুখ মনে রাখবার দরকারও নেই। স্বার্থপরতার মতো শোনালেও বিচিত্রার দরকার সীট'টির, তার অস্থায়ী মালিককে নয়। কিন্তু তাও আজ এই ব্যস্ততাতেও তার মুখটা মনে করবার চেষ্টা করল বিচিত্রা। হয়ত মনে আশা, বাসে উঠে যদি লোকটাকে দেখতে পায়।

বাসে উঠেই বিচিত্রা বুঝল আজ প্রচণ্ড ভীড়। দরজার ভীড় ঠেলে ভিতরে ঢোকা যাচ্ছে না। এরমধ্যে হঠাৎ ঈশারা করে একজন ভিতরে আসতে বলল। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। ফর্সা মুখ মোটা কাঁচা-পাকা গোঁফ। হ্যাঁ, এই তো লোকটা। আগের দু'দিন যে বিচিত্রাকে সীট দিয়েছিল। আজ ভালো করে বিচিত্রা লোকটার মুখটা দেখল। একটু ভালো করেই দেখল, যাতে বাস ছাড়াও অন্য কোথাও দেখা হলে চিনতে পারে। সুপুরুষ বলা যাবে না। কিন্তু তাও ভালোই দেখতে। অন্ততঃ যৌবনকালে ভালোই ছিল মনে হয়। আজ বড্ড বেশী ভীড়। ভীড় ঠেলে ভেতরে এগনোই যাচ্ছে না। এদিকে Next Stopage প্রায় এলো বলে। ভদ্রলোক উঠে পড়ল সীট থেকে। আজ আর সীটটা পাওয়া গেল না। অন্য একজন বসে পড়ল। নামবার সময় পেছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে দরজার কাছে এসে লোকটি স্মিত হেসে বলল, "Sorry, আজ আর হ'ল না।" বিচিত্রাও একটা হতাশা মেশানো হাসি দিল। দিনটা ছিল শনিবার। সুতরাং পরেরদিন এই পাওয়া না পাওয়ার কোনো খেলা নেই।

আজ কিন্তু পথে নয়, বাড়ি থেকে বের হয়েই লোকটার কথা মনে এল বিচিত্রার। মুখটাও পরিষ্কার মনে পড়ল। এবং বিচিত্রাও বুঝতে পারল না কেন জানিনা আজ প্রথম মুখটা মনে পড়ার সাথে সাথে কোথাও যেন একটা নিশ্চিন্ততার অনুভবও অনুভূত হল তার। প্রত্যাশা মত গাড়িতে উঠে লোকটিকে দেখতেও পেল। লোকটার কাছে আজ কিরকম যেন নিজস্ব একটা দাবির মতো এগোল বলে মনে হল তার নিজের। এবার একটা হাসি, এবং তার প্রতুত্তরে লোকটির হাসি। এবং অবশেষে মিনিট কুড়ি বাজে পরের Stopage-এ নেমে যাওয়া লোকটার ছেড়ে যাওয়া সীটে নিজের বিধ্বস্ত শরীটাকে নিশ্চিন্তে এলিয়ে দেওয়া।

প্রায় দুই বছরের বিধ্বস্থ, গ্লানিকর নিত্য বাসযাত্রায় এই প্রথম একটু নিশ্চিন্ততার আস্বাদ পেতে শুরু করল বিচিত্রা। যেন পেল একটু ভরসা। সৌজন্যে সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি। হাজার ভীড়ের মধ্যেও বাসে যার উপস্থিতি বিচিত্রাকে মরুভূমিতে মরুদ্যানের সন্ধান দেয়। কারণ, তার আকড়েই যে নিহিত রয়েছে বিচিত্রার বাকি একশ' মিনিটের প্রশান্তিময় বাসযাত্রা। প্রতিদিনকার এই একশ' মিনিটের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের যে কি মূল্য বিচিত্রার প্রাত্যহিক জীবনে তা একমাত্র বিচিত্রাই জানে।

এখন আর আগের মতো অতটা হন্ত-দন্ত হয়ে সকালে বের হতে হয় না বিচিত্রাকে। কারণ বাসে ওঠার লড়াইয়ে সবাইকে টেক্কা দিয়ে আগে ওঠার তাড়া তার নেই। বাসে উঠে Next Stoppage গুলোতে নামার লোকের তালিকা তৈরী করার দায়ও তার নেই। শুধু সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটিকে খুঁজে নেওয়া, কোথায় তিনি আজ উপবেশন করে আছেন বিচিত্রাকে সিংহাসন খালি করে দেবার প্রতীক্ষায়। বেশীরভাগ দিন অবশ্য সেই সামান্য অনুসন্ধানটুকুও করতে হয় না, কারণ 'এই যে ম্যাডাম, এদিকে' বলে সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বরই সীট মালিকের দিক্ নির্দেশ করে দেয়। ফলস্বরূপ বিচিত্রা এখন অনেক Relaxed ভাবে সংসারে মন দিতে পারে। মেয়ের পেছনেও অনেক সময় দিতে পারে।

চার

কি অদ্ভুত এক সম্পর্ক। লোকটা কে, কি করে, কোথায় থাকে, এরকম অনক কিছু জানার আগ্রহ থাকলেও জানার অবকাশ নেই। ভীড়ের ঠাসা বাসে গাড়ি জোরাল শব্দের ভিতর দিয়ে এই সব কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। তাও ঐ ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে ভাবা যেতে পারে যে একই অবস্থা লোকটারও। তবুও এই অব্যক্ততার মধ্যেও কি অদ্ভূত এক সম্পর্ক গড়ে উঠল। যেন লোকটার সীটটার একমাত্র দাবিদার বিচিত্রা। দিনে দিনে সে অনুভব করল তার মধ্যে বাসে উঠে সীট দখলের প্রতিযোগিতায় নামার ভয় চলে গেছে। এবং ঐ একই Stoppage-এ অন্য কেউ সীট ছেড়ে নামলেও সেই সীটে বসার থেকে লোকটার ছেড়ে দেওয়া সীটে বসতেই বিচিত্রা বিশেষ আগ্রহী এবং অভ্যস্ত। হয়ত লোকটির ষাট বছর

পর্যন্ত বিচিত্রারই ঐ সীটের প্রতি অধিকার। পৃথিবীর কোথাও কোনদিন ওই লোকটার সাথে হয়ত বিচিত্রার দেখা হবে না, তার কোনো বিষয়ই হয়ত বিচিত্রার জানা হবে না, অথচ প্রতিদিনই ওই ২০ মিনিট বাসে যাওয়ার সময় তাকে কোনো এক সীটে বসে থাকতে বিচিত্রা দেখতে চায়। কোনো দিন দেখতে না পেলে খারাপ লাগে, পরের দিন দেখা হলেও না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করা যায় না।

এভাবেই চলতে চলতে '২০ মিনিটের সম্পর্কে' জড়িয়ে পড়ে কবে সে তেরটা বছর বিচিত্রা পার করে দিয়েছে তা সে নিজেই খেয়াল করে নি। তার এই নিয়ম করে সীট প্রাপ্তি, তাও এক পুরুষ মানুষের কাছ থেকে,—এই ঘটনা যে নিত্যযাত্রী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেনি, তা নয়। সহযাত্রীদের কাছ থেকে বহুবার তাকে এ নিয়ে তির্যক প্রশ্ন ও মন্তব্য শুনতে হয়েছে। বহু রসালো আলোচনাও তার কানে এসেছে। কিন্তু সে এগুলিকে মনে ও মাথায় স্থান দেয়নি। সুচারুভাবে এড়িয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তাও একদিন ধামা-চাপা পড়ে গেছে।

এতগুলো বছরের তার মনেও যে প্রশ্ন দানা বাঁধেনি, তাও তো নয়। কেন ভদ্রলোক তাকেই একমাত্র সীট ছেড়ে দেয়? কেন হাজার ভীড়ের মধ্যে থেকেও বিচিত্রাকে ঠিক খুঁজে বের করে নেয়? এসব প্রশ্নের সদুত্তর বিচিত্রা আজও পায়নি। বিচিত্রার নিজের মনের উচাটনের সদুত্তরও কি বিচিত্রা আজও পেয়েছে?

যাক সে কথা। ভদ্রলোকটি বদান্যতায় তার দীর্ঘ বাস জার্নির কষ্ট তো দূর হয়েছে। তার ফলেই না এতগুলো বছর সে এই রুটে জার্নি করে কাটিয়ে দিতে পারল। নইলে হয়ত মাঝপথেই চাকরিতে ছেদ টানতে হত। অন্তঃ এই কৃতজ্ঞতাটুকু ভদ্রলোকটিকে একদিন বিচিত্রার ব্যাখ্যা করা উচিত।

কিন্তু তার সুযোগ কোথায়? তেরো বছরেই তা হয়ে উঠল না, আর এক বছরের মধ্যে হবে?

হ্যাঁ, এক বছরই তো। আজ ডি. আই. (D.I.) অফিসের বড়বাবু যেভাবে তথাগতকে আশ্বাস দিলেন তাতে বড়জোর এক বছর লাগা উচিত তার ট্রান্সফার হয়ে বাড়ির কাছে স্কুলটিতে আসতে।

এরজন্য এতবছর ধরে কম কাঠ-খড় পোড়াতে হচ্ছে? অথচ এই স্কুলটিতেই তার প্রথমে হবার কথা ছিল। কোর্ট কেসে তাদের নিয়োগের প্যানেল আটকে যাওয়ায় অন্য ব্যক্তিকে স্কুল নিয়োগ করে ফেলে। তারপর বিচিত্রাদের প্যানেল যখন পুনর্বহাল হয় তখন কোনো Vacancy ওই স্কুলে না থাকায় বিচিত্রাকে যেতে হয় দূরের বর্তমানের স্কুলটিতে। অবশেষে সেই ব্যক্তি তার আট মাস পর Retired করবে বলে তার জায়গায় বিচিত্রা ফিরে আসতে পারবে। সব মিলিয়ে বড়জোর এক বছর লাগবে।

পাঁচ

বিচিত্রার মন আজ বেশ ফুরফুরে। একে তো আর কয়েকমাসের মধ্যেই সে বাড়ির কাছে স্কুলে জয়েন করতে চলেছে আর দ্বিতীয়তঃ, মেয়ের একটা মনঃপুত সম্বন্ধ এসেছে। বিচিত্রার ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগে তার স্কুলে জয়েন করার সময় এই সেদিনের ক্লাস সিক্সে পড়া চিত্রলেখা আজ মাস্টার ডিগ্রী পার করে কেমন করে যেন আজ বিয়েরযোগ্যা হয়ে উঠেছে। মাঝখানের পনেরোটা বছর কি করেই যে পেরিয়ে গেল আজও ভাবাই যায় না। অথচ স্কুল ও সংসার মিলেমিশে কম ধকল পোহাতে হয়েছে বিচিত্রাকে। অবশ্য শেষ তেরোটা বছর সহায় ছিল তার 'সীট-বন্ধু'। আর নয়, এবার আর এই 'সীট-বন্ধু'র সাথে আলাপ-জমাতেই হবে। আর তো কটা মাস। এরমধ্যে পরিচয়টা না সারলে তো আর দেখাই হবে না। আর যাই হোক, বিচিত্রা এই ভদ্রলোকটির সাথে পরিচয়টা অন্ততঃ রেখে দিতে চায়।

বিচিত্রা ভাবে, যদিও ভীড়ভর্তি বাসে এমন পজিশনে তারা দু'জনে অবস্থান করে যেখানে কোন আলাপ-পরিচয় করা কি, কোনো কথা বলারও অবকাশ থাকে না। তবুও এই দীর্ঘ তেরো বছরে তাদের সম্পর্কটাকি 'এই যে ম্যাডাম, এদিকে,' 'Thank you", 'Sorry, আজকে আর সীটটা দিতে পারলাম না', —এই টুকরো-টাকরা সৌজন্যমূলক কথা ও পারস্পরিক সৌজন্য জ্ঞাপক হাসির বাইরে এগোতে পারত না? তবে এগোলো না কেন? ভদ্রলোক নিজেও তো কোনোদিন এর বাইরে আলাপ করার আগ্রহ দেখায়নি। বিচিত্রাও নিজেকে সামলে রেখেছে। আগ্রহ দেখিয়েছে সীট-প্রাপ্তিতে। তবে বাধাটা এল কি উভয়ের সামাজিকতাবোধ ও পারস্পরিক রুচিবোধ থেকে? বিচিত্রা কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। তার নিজের উপর খুব রাগ হ'ল। অভিমান হল লোকটির উপরও। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আজ সে সব বাধা ভাঙ্গবে। লোকটির সাথে আলাপ করেই ছাড়বে। কথা বলতে গিয়ে যদি সীট দখল হয়ে যায় তাও আচ্ছা। সীটের যুদ্ধ তো আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন।